OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 172 – 183
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 172 - 183
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা কবিতার আরশিতে কর্মহীনের আর্তনাদ

ড. ইন্দ্রজিৎ ঘোষ
Email ID : indrajitghosh2291@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Unemployment, Social impact, Corruption and politics, Bengali Poetry.

Abstract
Unemployment brings immense difficulties. Mental anguish, regret, and even suicide emerge as people struggle against distress. Its toll touches all of society and art. Though joblessness first struck India after British rule's start, its true impact arose mid-20th century. Then, many flocked to bustling Calcutta hoping work would save them from want. All banked on government roles to end their woes. Only book learning seemed to offer positions. From that midpoint forward, the number of educated without employment ballooned exponentially. Bengali works told of sufferers' plight. Though this scourge hammers lives, strength endures in community and compassion. Creativity blooms as writers give voice to victims' resilience. Together may we ease others' burdens through empathy, reform and will to persevere where fate deals cruel blows. After the nation gained freedom in 1947, the new government was unable to alleviate the plight of the many unemployed citizens. Efforts to address the issue were lacking. Recruitment agencies instead saw corruption skyrocket, a problem persisting today. Political squabbles and abuse of authority continue damaging the lives of educated and talented individuals left searching for opportunity. Literary works portray the deteriorating struggle to survive, depicting defeat in life's battles and the attempts at self-sufficiency by those repeatedly crushed. Poetry once failed to show the unemployed finding establishment. As ever, verses broached this important matter. One poem presented a vision of the difficulties confronting youth scorched by the pain of joblessness. It also called for resisting such suffering. Another work described a man's journey after losing his role, wondering how to find purpose anew despite facing rejection at every turn.

Discussion

বেকারত্ব - এই ছোট শব্দটির মধ্যে দিয়ে কর্মহীনের বাস্তবিক পরিস্থিতি কি বোঝা যায়! না যায় না। যেতে পারে না। আভিধানিক ও ব্যাকরণগত দিক থেকে ব্যবহৃত শব্দ সার্থক বলে প্রতিপন্ন হলেই যে, তা সমাজের বা ভুক্তযোগী মানুষের জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যাচার্থ ও ব্যঙ্গার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাবে তা নাও হতে পারে। বেকারত্বের ক্ষেত্রে হয়ও নি। আভিধানিক অর্থে বেকারত্ব বলতে কর্মহীনতাকেই ইঙ্গিত করে। তাত্ত্বিকেরা আবার বেকারত্বকে সংজ্ঞায় বেঁধে বলেন, বড়লোকের ছেলে কোন কাজ না করে যদি চুপচাপ বাড়িতে শুয়ে-বসে সময় কাটায় তাকে বেকার বলে না। যে কাজ চায়,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 172 – 183
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিন্তু কাজের অভাব ঘটলেই বেকারত্ব। অন্য সকলে যে মাসিক বেতনে কাজ করছে সেই মাহিনায় যারা কাজ খুঁজেও পাচ্ছে না তারাই বেকার।[১] পাঠককুলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের দিক থেকে বেকারত্বের জুতসই সংজ্ঞা আপনি পেলেন; মানুষের আবেগ সমাজনীতি/ অর্থনীতির ধারধারে! তাহলে জিজ্ঞাসা বেকারত্ব কী? সমাজতত্ত্ববিদেরা ভুল সংজ্ঞা দিলেন নাকি! একেবারেই নয়। হতেই পারে না। তাদের দেওয়া নামকরণ, তার সপক্ষে দেওয়া যুক্তি ভুল নয়। বেকারত্বের আভিধানিক অর্থের মত, সমাজতাত্ত্বিক প্রদত্ত সংজ্ঞাও অসম্পূর্ণতায় পূর্ণ কিছু কথা। এবং অবশ্যই স্বীকার্য আমাদের অভিমত মানুষের অনুভূতির মানদণ্ডের ওপরে বিচার্য। আমাদের বিচারে বাংলা ভাষায় ভাবপ্রকাশে অনেক সময় শব্দ সংকটের সম্মুখীন হয়, বেকারত্বের ক্ষেত্রেও সেরকমই ঘটেছে। বেকারত্ব বা কর্মহীন শব্দটি বাস্তবিক ক্ষেত্রে যে সুদূরপ্রসারী আঘাত মানব জীবনের ওপর বিস্তার করে, তার ছিঁটেফোটাও 'বেকারত্ব' শব্দ উল্লেখে অনুভব করা যায় না।

বেকারত্ব সম্পর্কে বর্তমান লেখকের অভিমত সম্পর্কে অবশ্যই পাঠককুল অবগত হলেন। এবারে জ্ঞানপাপীর অনুকরণে গালভরা কথাবলা যাক। বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা বেকারত্ব। প্রায় সব দেশেই বেকারত্বের হার বাড়ছে। কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির একটা বড় কারণ উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সব বিষয়ের একটা সরলীকরণ করা হয়; উল্লিখিত কারণও অনেকটা সেইরকম। বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী বেকারত্বের বহুবিধ কারণ রয়েছে— জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়নের অভাব, ধীর শিল্প বৃদ্ধি, নির্ভরতা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, অপর্যাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের আধিপত্য।[২]

সমস্ত ধরণের বেকারত্ব নিয়ে আমরা কথা বলব না। আমাদের বিষয় শিক্ষিত বেকারের যন্ত্রণা। তবে শিক্ষিতকে আপনি 'তথাকথিত' আখ্যাতে ভূষিত করতেই পারেন। বেকারত্বের আভিধানিক ভূষণে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বেকারকে কাঠামোগত বেকারত্বের অভিধা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন দীর্ঘ সময় ব্যয়ে অর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন কর্ম উপযোগী শিক্ষা শিক্ষার্থীকে দেওয়া হবে না? এ ব্যর্থতার দায় কার? অথচ স্কুল-কলেজের শিক্ষা একজন যুবক বা যুবতী কায়িক শ্রমের দিক থেকে বিমুখ করে তোলে একথা কারও অজানা নয়। তাহলে স্কুল-কলেজ শিক্ষা কি জন্য। কি জন্য ব্রিটিশ ছেড়ে যাওয়াও ৭৮ বছর পরে এসেও কেরানিগিরির শিক্ষা চালু থাকবে। যদি সেই শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত থাকেও, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকার বিরূপ কেন? ১৮৩৫ সালে ম্যাকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা কি একবিংশ শতাব্দীতেও প্রাসঙ্গিক! যদি না হয় পরিবর্তন জরুরি। শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তন হলে এতদিন পর্যন্ত যাদের পুরানো পদ্ধতিতে রাষ্ট্র শিক্ষিত করল তাদের পরিণতি কি? প্রশ্ন অনেক। সমাধানও হয়তো কঠিন নয়। কিন্তু সৎচেষ্টা কোন রাষ্ট্র কবে করেছে! পরিণতি দুর্ভোগ।

সাহিত্য কী বলে? নেতি নেতি করে প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় সাহিত্য কী বলে না! সমাজে ঘটে যাওয়া প্রায় সমস্ত ঘটনাই সাহিত্যের বিষয়। আবার প্রশ্ন সাহিত্য কীভাবে বলে? সাহিত্য মানুষের সমস্যার কথা বলে, সাধারণের দুর্দশার বর্ণনা দেয়। দরদী পাঠককুলে শোকের বাণ ডাকিয়ে ছাড়ে। সাহিত্য কাদের কথা বলে? প্রথম যুগের সাহিত্য দেবতা; মাঝের যুগের সাহিত্য উচ্চশ্রেণি; তার পরবর্তী সাহিত্য মধ্যশ্রেণির; আর একেবারে হাল আমলের সাহিত্য নিম্নশ্রেণির মানুষের কথা, তাদের জীবন যন্ত্রণার চিত্র নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে উপস্থাপন করে চলেছে। সাহিত্যপ্রেমী মানুষ দুহাত তুলে প্রশংসা করে বলবেন সাহিত্যের জয় হোক। যে সময়ে এক মানুষ অন্য মানুষের পাশে থাকতে ভয় পায়, সে পরিস্থিতিতে সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয়ভাবে অসহায় মানুষগুলোর কথা বলছে, জনসমক্ষে তুলে আনছেন। কিন্তু মুদ্রার একদিক দেখে সেটা বিচার করা যুক্তিহীনতা নয় কী! এবারে মনে হবে মুদ্রার অন্যদিকটা কী? আমরা বললাম সাহিত্য সমস্যার কথা বলে। আচ্ছা সমাধানের কথা সাহিত্যে ঠিক কতটা বলা হয়। বাংলা সাহিত্যের সচেতন পাঠক মাত্রই খেয়াল করবেন সাহিত্য সমাধানের উপায় প্রায় দেখায় না বললেই চলে। সমস্যা নিয়েই তার কারবার। কখনো কখনো হয়তো বা সমাধানের কথায় উঠে আসে, কিন্তু সে বড় নগণ্য। আর বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই উদাহরণটা আরও কম। সে দেশভাগকেন্দ্রিক সাহিত্য হোক কিংবা মানবিকতার পতন নির্দেশক সাহিত্য। আলোচ্য বেকারত্বের সমস্যাও এর ব্যতিক্রম নয়। বেকারত্ব জীবনের ছোট্ট একটি অংশ। কমবেশি প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের জীবনে অল্প সময়ের জন্যও এটি আসে। তাই হয়তো বেকারত্ব আর পাঁচটা গা সওয়া বিষয়ের একটি হয়েই থেকে যায়; সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সমস্যাতে গা সেঁকে নিতেই সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষেরা বদ্ধপরিকর হয়ে যান। আর সেই মতাবেক সাহিত্যে বেকারের জীবন যন্ত্রণা উঠে আসে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কর্মহীন ও কর্মনুসন্ধানী মানুষের জীবন উঠে এসেছে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের কলমে। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসে খুব স্বল্প পরিসরে নায়ক সত্যচরণের কর্মহীন জীবনের চিত্র উঠে আসে। জীবনানন্দ দাশের 'চাকরি নেই', 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়', প্রমথ নাথ বিশীর 'ন-ন-লৌ-ব-লি', 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়', সন্তোষকুমার ঘোষের 'কানাকড়ি', 'দ্বিজ' প্রভৃতি গল্প এবং একেবারে হাল আমলের উল্লাস মল্লিক সহ আরও অনেকের লেখায় বেকারত্ব গুরুত্ব পেয়েছে। আমাদের মূল আলোচনা যেহেতু বাংলা কবিতায় বেকারত্ব নিয়ে, সেকারণে বাংলা কবিতায় বেকারত্বের দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা থাকবে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথমবারের মতো বেকারের কথা উঠে এল ১৭৮০-৯০ সালের মধ্যকালীন সময়ে লেখা রামকান্ত রায় অনাদিমঙ্গল কাব্যে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে কবি ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙালির সাহিত্য-সমাজে শিক্ষিত বেকারের জীবন যন্ত্রণার পরিচয় ঘটালেন। রামকান্ত রায় নিজের কর্ম জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখছেন –

"মাস ছয় বেকারে বসিয়া আছি ঘরে/ স্থিতি কাজ মোর মনে নাই ধরে।"[৩]

কৃষিপ্রধান দেশে 'স্থিতিকাজ' অর্থাৎ কৃষিকাজ করে এক যুবক তার জীবিকা নির্বাহ করবে তেমনি ভবিতব্য। রামকান্ত রায় শিক্ষিত যুবক। অর্জিত শিক্ষার মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করতে চেয়েছেন। পূর্বজদের কৃষিকাজের পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তিকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে চাইছেন। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। রামকান্ত কর্মহীন থাকছেন। তাই তিনি বেকার।

একজন শিক্ষিত যুবক, অর্জিত শিক্ষাকেই নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবহার করতে চাইবেন। কিন্তু শিক্ষিত যুবক বা যুবতী, অর্জন করা শিক্ষার মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করতে না পারে তাহলে সার্থকতা কোথায়? কিন্তু এ প্রশ্ন তো সুশীল সমাজের। একটা কর্মহীন মন শুধু বোঝে যন্ত্রণার কথা। একবারে আধুনিক জীবনের মতই কর্মহীন যুবকের যন্ত্রণাকে উপস্থিত করলেন মধ্যযুগের কবি। তিনি লিখলেন –

"কাহারে কিছু না বলি অন্তর গুমরে
সারাদিন বেড়াই সভায় ঘরে ঘরে।
বহুদিন ডানি বাহু ডানি চক্ষু নাচে
ইচ্ছা নাই শয়নে শর্বরী জাগরণে
উষ্মা হয় যদি কিছু বলে কোন জনে।"[৪]

শিক্ষিত বেকারের জীবন যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এখানে। কমবেশি আড়াইশো বছর আগে বেকারত্বের যন্ত্রণা প্রসঙ্গে এহেন উপলব্ধি সাহিত্যে একেবারেই আনকোরা। বিষয়টি পূর্বপুরুষের। কিন্তু যন্ত্রণার নিরিখে! প্রকাশের তাগিদে কী বিষয়টি আমাদের নয়! আসলে কর্মহীন মানুষের মনোকষ্টের কোন স্থান হয় না, কোন কাল হয় না।

তবুও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বেকার যন্ত্রণার সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের বেকার যন্ত্রণার তুলনা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। দুই যুগের সমাজব্যবস্থা আলাদা, চিন্তা চেতনা আলাদা। স্বাভাবিকভাবে দুই যুগের সাহিত্যকে একই গোত্রে বিবেচনা করা উচিত নয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষ লগ্নেও ইংরেজ আগমনের প্রায় সূচনায় (সুকুমার সেনের মতানুসারে অনাদিমঙ্গলের রচনাকাল ১৭৯০ খ্রি.) লেখা অনাদিমঙ্গলের কবি রামকান্ত শিক্ষিত যুবক। গ্রাম বাংলার প্রচলিত কর্ম পদ্ধতিতে মনের পরিতৃপ্তি ঘটাতে না পেরে বুদ্ধিবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে চাইছেন কবি। মধ্যযুগীয় পোশাক খুলতে না পারা বাংলাসমাজে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার পরিবর্তে বিকল্প কিছু ভাবা কার্যত অপরাধ স্বরূপ; তারই মধ্যে বিস্ফোরণ। সত্যি বলতে ধর্মমঙ্গলের কবির উচ্চারণ ব্যতিক্রমী ঘটনা। কৃষি প্রধান দেশে 'স্থিতিকাজ' অর্থাৎ কৃষিকাজ করে এক যুবক জীবিকা নির্বাহ করবে তেমনি ছিল ভবিতব্য। কিন্তু একজন শিক্ষিত যুবক/ যুবতী অর্জিত শিক্ষার মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করতে চাইলেন, ঠিক তখনই সমস্যার সূত্রপাত ঘটল।

বাংলা সমাজ তথা সাহিত্য তৎকালীন অবস্থা থেকে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। ১৭৬৫ খ্রি. পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ণ আগ্রাসন চলে। ধীরে ধীরে ভারতীয় সভ্যতায় পাশ্চাত্য আধিপত্য কায়েম হতে থাকে। 'চুঁইয়ে পড়া' নীতিতে জনগণের মানসিকতার বদল শুরু হয়। উচ্চবিত্ত থেকে সাধারণ মানুষ (অবশ্যই প্রত্যেকে নয়) উপলব্ধি করে সরকারি বা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 172 – 183
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শাসকের দেওয়া পদে অধিষ্টিত থাকলে অর্থ ও সম্মান দুইই প্রাপ্তি ঘটে। সর্বোপরি স্বনির্ভতার কাজ বিশেষত কৃষির আর্থিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দেয় চাকুরি।

অন্যান্য অনেক কিছুর মতই ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে বেকারত্ব নামক বিষয়টিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবদান রয়েছে। ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের শুরু থেকেই বেকারত্বের প্রসঙ্গ সমাজে উঁকি দিতে থাকে। যার পরিণতি পায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ আত্তীকরণে। ভারতীয় সমাজে বেকারত্বের পূর্ণ ছোবল পৌঁছল বিশ শতকের শুরু থেকেই। তৎকালীন সমাজ চিত্র যার সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু এর কারণ কী? কেন মানুষ চাকরিমুখী হল? বলা ভালো কেন মানুষ কর্মের ক্ষেত্রে পর মুখাপেক্ষী হল? নিম্নবর্গের মানুষ সরকারি পদের মাধ্যমে নিজের আর্থিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পরিকল্পনা করতে থাকে। দীর্ঘ সময় উচ্চবর্ণের দ্বারা অবহেলিত হয়ে সরকারি বেশ কিছু নীতিমালা সুবাদে অবহেলিত মানুষ সমাজের উচ্চস্তরে নিজের ছাপ রাখতে সবচেয়ে সহজ কৌশল হল শাসকের চাকর বৃত্তি করা। অর্থাৎ নিজেকে চাকরির জন্য প্রস্তুত করা। সমাজ সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানবেন কোন একদিন বা দুদিনে ভারতের সুদীর্ঘ শিক্ষা কাঠামোর কিংবা মানুষের জীবন দর্শনের পরিবর্তন ঘটতে পারে না। এর জন্য বিরাট আয়োজন। কিছু সংখ্যক মানুষের স্বার্থ পূরণের প্রচেষ্টা। ১৮৩৫-এর মেকলে নীতি ভারতে education system কে ভেঙে দেয়। তার আগে পর্যন্ত গুরুকূল ও মাদ্রাসা শিক্ষা সমান তালে চলছিল। দুই শিক্ষা পদ্ধতিই ভারতের সংস্কৃতি মেনে হওয়ায় খুব বেশি সমস্যা তৈরি হয়নি। কিন্তু স্কুলকেন্দ্রিক কেরানি তৈরির কারখানায় একজন যুবক/যুবতী মুখস্থ বুলি আওরাতে শিখেছে। স্কুলের ঘণ্টার আওয়াজ সমানুবর্তিতা ও পরীক্ষা পাসের ফাঁদ শিক্ষার্থীকে জীবনমুখী শিক্ষার পরিবর্তে সমাজ বিমুখ শিক্ষা দিতে শুরু করল। ফলে কারখানায় কেরানি তৈরি হয়েছে। কেরনির প্রয়োজন যখন কমছে তখনই বেকারত্ব বেড়েছে।

মধ্যযুগের সমাজে বিশেষত আঠারো শতকের আগে চাকুরি প্রবণতা দেখা যায় না বললেই চলে। স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্যে তার প্রভাব কম। কিন্তু বিশ শতকে তিনের দশকের পরে মধ্যবিত্তের (উচ্চমধ্য, মধ্যমধ্য ও নিম্নমধ্য) মধ্যে চাকরির বিরাট চাহিদা তৈরি হয়। যার দলিল হয়ে রয়ে যায় বাংলা সাহিত্য। আধুনিক বাংলা কবিতায় বেকারত্ব বিষয়ে প্রথম কবিতা 'বেকার বিহঙ্গ'। কবি বিষ্ণু দে। রচনাকাল ১৯৩৪। রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতার বিষয়টি একটু পরিবর্তন করে বেকার জীবনের সাথে জুড়ে দিলেন বিষ্ণু দে। দু-জনেই দুঃসময়ে মনোবল না হারিয়ে এগিয়ে চলতে বললেন। প্রথমজনের উপজীব্য হল ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, দ্বিতীয়জন সেখানে যুবসমাজে বেকারত্বকে মাধ্যম করলেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট 'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,/ এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।' পরিবর্তন করে বিষ্ণু দে লিখলেন— 'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,/ কোরো না অন্ধ বন্ধ জটায়ুপাখা।' ১৮৯৭ সালের ২৮ এপ্রিল লেখা 'দুঃসময়' কবিতাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রকাব্য সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখছেন —

> "তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) এতদিনের পরমপ্রিয় রসজীবনের-শিল্পজীবনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে-তাঁহার চিত্ত-বিহঙ্গকে তাহার চিরপরিচিত নীড় ছাড়িয়া একাকী অজানা পথে নূতন জীবনের উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইবে। তাহাতে বহু ভয়, বহু সংকোচ, বহু সন্দেহ; তবুও নির্ভয়ে তাহাকে এই দুঃসাহসিক অভিযানে বাহির হইতে হইবে।"[৫]

আবার প্রমথনাথ বিশী লিখলেন —

> "এই দ্বিধার মুহূর্তে কবির অপেক্ষাকৃত জড় অংশ ভীত ও সন্দিগ্ধ, কিন্তু তবু তাঁহার অগাধ বিশ্বাস নিজের অন্তরতম কবিপ্রকৃতির প্রতি।"[৬]

বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চলনকে সামাজিকতায় উত্তীর্ণ করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের- 'উষা-দিশা-হারা নিবিড়-তিমির-আঁকা;' বিষ্ণু দে'র হাতে উঠে এল- 'অস্তাচলের আঁধারেই কিবা আশা?' হয়ে। কিন্তু লক্ষ্য গেল বদলে। ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে উঠল সর্বজনীন।

বিষ্ণু দে কবিতার মূলভাব হতশার পরিবর্তে আশা। শত বাধা সত্ত্বেও নিজেকে গুটিয়ে না নিয়ে স্বপ্নসন্ধানী হতে বললেন বিষ্ণু দে। একজন শিক্ষিত কর্মহীনের জীবন কাহিনির আধারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিঃশেষ হতে না দিয়ে জটায়ু'র পাখার মত নিজেকে মেলে ধরার বার্তা দিলেন কবি।

১৯৩৪ সালে লেখা কবিতাটিতে বিষ্ণু দে একটি শিক্ষিত কর্মহীন যুবকের মনের চোরাগলির সন্ধান করিয়েছেন পাঠকবৃন্দকে। কবিতাটি কবি শুরু করেছেন হতাশাগ্রস্থ হয়ে। যেখানে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও ভবিষ্যতের কোন আশা দেখা যাচ্ছে না। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে কবি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। বাস্তব জীবনে একজন বেকারকে অবশ্যই শুনতে হয় চাকরি যখন হচ্ছে না ব্যবসা বা অন্য কিছু করো। বিষ্ণু দে লিখলেন —

"জানি লক্ষ্মীর বসতি বাণিজ্যেই, /সেই সাধনায় মেনেছি সতত হার।"[৭]

সামাজিক একটি মিথ, পড়াশোনা করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে। কিন্তু গাড়ি চাপার কারণ অর্থ। অর্থাৎ পড়াশোনা করলে বা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সামাজিক মর্যাদা সঙ্গে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে। কিন্তু সমাজ যখন পড়াশোনা করা যুবকটিকে অর্থের সংস্থান করে দিতে পারল না তখন শিক্ষিত যুবকটির আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে বলতেই পারেন- 'সরস্বতীর পঙ্কজে লাগে কাঁটা।' পড়াশোনার কারণে সে বহির্বিশ্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পাছে পড়াশোনার বিঘ্ন না ঘটে- 'বিরাট বিশ্বে কবে হারিয়েছে খেই। তিনের দশকের যুবকেরা কৈশোর কাটিয়েছেন গান্ধীজীর ধর্মঘট, আবেদন-নিবেদন রাজনীতির সঙ্গে। তারা গান্ধীকে স্মরণীয় মেনেছেন, একই সঙ্গে সংসারে জাঁতাকলে তারা জেনেছেন আদর্শ ও বাস্তবের তফাৎ। তাইতো তারা মাস্টার বা কেরানি হতে চেয়েছেন।

যৌনাকাঙ্ক্ষা মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলোর একটি। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহই পারে যৌনকাঙ্খার নিবৃত্তি ঘটাতে পারে। আর বিবাহ মানেই একটি মেয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব একটি পুরুষের। কিন্তু অর্থ কোথায়? তাই যুবকটির যৌননিবৃত্তির ভার পড়ে সিনেমার পোস্টারের। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না, তাই মেসের তক্তপোশে বসে সংবাদপত্রের কর্মখালির বিজ্ঞাপনে নজর থাকে। বিষ্ণু দে সমস্ত কিছুর পক্ষে লিখলেন —

"অতএব, মেসে কাটাও তক্তাপোশে/ দৈনিক দেখ কাজ খালি কোথা ক'ষে,/ খেলার নেশায় ভিড় ভাঙো মাঠ চ'ষে,/ আর দেখ র'সে সিনেমার পোস্টার।"[৮]

হতাশার মধ্যে কাটা সমস্ত দিনের শেষে শরীরে ক্লান্তি গ্রাস করে। অস্থির, কর্মহীন, নিরাশায় পূর্ণ মন ব্যস্ত থাকতে চায়। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। কবি ভয় পেয়ে যুবগোষ্ঠীকে বাজে কাজে লিপ্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সাথে জটায়ুর মত মহাশক্তির বিরুদ্ধে মন স্থির করতে বলেছেন —

"তবু হে কুমার খেলো না শকুনি-পাশা।/ ইতিহ-ভাগ্য জড়াক না নাগপাশে-/ তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর/ কোরো না অন্ধ বন্ধ জটায়ুপাখা।"[৯]

বেকারত্ব বিষয়ে সমর সেনের কবিতা 'একটি বেকার প্রেমিক।' সদ্য কৈশোর পার করা কবির কবিতায় 'ডিপ্রেশন'-ই প্রধান হয়ে উঠেছে। কবিতায় কোন চলন নেই; কবিতাটি একই স্থানে ঘুরপাক খেয়েছে। শুধুমাত্র মাঝে রয়ে যায় কয়েকটি শব্দের ঝংকার ও চিত্রকল্পের খেলা আর মনের মধ্যে অজানা শূন্যতা। কবিতায় কলকাতা শহরের এক যুবককে উপস্থাপন করেছেন কবি। যুবকের বিচরণ চোরা গলি থেকে রাজপথ। যৌনগন্ধী কবিতাটিতে বেকারত্বের চিন্তাযুক্ত যুবকের ভাবনার চূড়ান্ত বর্হিপ্রকাশ ঘটাতে কবি সিগারেট, প্রেম আর ফিরিঙ্গি মেয়েকে বেছে নিলেন। কবি লিখলেন —

"হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি;/ আর শহরের রাস্তায় কখনো-বা প্রাণপণে দেখি/ ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।"[১০]

কবি কর্পোরেট স্টাইলে সাজানো কলকাতা শহরে মানবিকতা, বিবেকবোধের অভাব সবসময়ে অনুভব করে চলেছেন। বেকারত্বে পূর্ণ জীবনে সময় অনেক। সময়ের ওপর ভর করে সমাজের অলিগলিতে ঘোরেন কবি। আবেগ বর্জিত শহরের মানুষ সম্পর্কে জেনে, জীবন সম্পর্কে নিজের কর্মজীবন সম্পর্কে একধরণের উদাসীনতা গ্রাস করে ফেলে কবিকে। যার জেরে নিজেকে ক্লান্ত মনে করেন কবি। এসব থেকে মুক্তি পেতে গাঝাড়া দিয়ে ওঠেন কবি। বলে ওঠেন —

"পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো/ হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।"[১১]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বেকারত্ব নামধারী কবিতা 'বেকার জীবনের পাঁচালি'। সমগ্র সাহিত্য জীবনে বেকারত্বকে বিভিন্ন ভাবে ভাষা দিয়েছেন বীরেন্দ্র। কাব্যজগতে বীরেন্দ্রের সংগ্রামী আবেদনের তুলনায় আলোচ্য কবিতাটি ব্যতিক্রমী। কবিতাটির ভিত্তি 'কীবা আসে যায়'। বেকার জীবনের প্রধান হল ডিপ্রেশন, উদাস ভাব। জগতে যা কিছু ঘটে চলে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা। ইচ্ছাকৃত নয়, আবার অনিচ্ছায়ও নয়। এক আশ্চর্য অনুভূতিতে ভর করে বেকার মন বলে ওঠে 'কীবা আসে যায়' তাতে! বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আশ্চর্য অনুভূতিরই বর্হিপ্রকাশ ঘটালেন 'বেকার জীবনের পাঁচালি'তে। কবিতার জুড়ে দেখালেন, ভালো/ খারাপ, খুব ভালো কিংবা খুব খারাপ যায় ঘটে যাক না কেন, বেকার জীবনের কোনো সুরাহা হয় না। কবিতার তিনটি স্তবক জুড়ে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখে করে নিজের অবস্থানের তুলনা করলেন কবি। কবিতার লিখলেন-

ক. "কীবা আসে যায় আশ্বিনে যদি আকাশ বিষায় কালো মেঘে
শরতের রোদ মুছে নিয়ে যায় মরা শ্রাবণের মেঘে মেঘে
হেমন্তে যদি বাতাস ফোঁপায় কিংবা পঙ্গপাল আসে
অসময়ে গাঁয়ে খামারে গঞ্জে বস্তিতে বাঁকা শীত হাসে।"[১২]

খ. "কীবা আসে যায় বন্দর যদি শ্মশানের ছাই গায়ে মাখে
ঘরে ঘরে মরা শিশুর কান্না ক্ষুধিত মায়েরা মনে রাখে
কাব্যের ফাঁকে 'নেই নেই' ঢোকে, জাত-কবিদের ভাত মারে
কিংবা শিল্পী স্বপ্ন বানায় হাজার শিশুর মরা হাড়ে।"[১৩]

গ. "কীবা আসে যায় চাঁদ যদি ফেরে লজ্জায় ঘরে উঁকি দিয়ে
কড়িকাঠে ঝোলে বিবসনা নারী হবু-কবিদের ফাঁকি দিয়ে
কিংবা সাগর ফুলে ফেঁপে ওঠে, গর্জায় আর চোখ রাঙায়
উজিরের ঘুম ভাঙে অসময়ে, কোটাল সভয়ে বিদেশ যায়।"[১৪]

ওপরের কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি খেয়াল করলেই বোঝা যাবে ১৯৫০ সালের আশেপাশে লেখা কবিতায় সমকালীন সময় কীভাবে ওঠে এল। বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার পরেও সাধারণ জনজীবনের যে কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি তারই চিত্র উঠে আসে কবিতায়। রোমান্টিসিজম্ ও চূড়ান্ত বাস্তবতার সহাবস্থান ঘটিয়ে কবি দেখালেন বেকারত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ যুবগোষ্ঠীর তাতে কিছুই এসে যায় না। শিক্ষিত যুবকটি বুঝতে পারেন যা ঘটছে তা অন্যায়। সমাজের গুরুরা যা ঘটিয়ে চলেছেন তাতে সমাজের ক্ষতি। কিন্তু সে কী করতে পারে! কারণ 'কীবা আসে যায়' তাতে! আমাদের আলোচ্য 'বেকার জীবনের পাঁচালি' কবিতার তিন স্তবকের প্রত্যেকটিতে ছটি করে পঙক্তি ছিল। প্রত্যেক স্তবকে শেষ দুই পঙক্তি আমরা যথাক্রমে সাজাচ্ছি। সচেতন পাঠক লক্ষ্য করবেন, কবির সব কিছু থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা। যে ইচ্ছা অনিচ্ছারই ফসল –

ক. "তাতে আমাদের কতটুকু ক্ষতি, মিতে!
এসো, তালি-দেওয়া জুতোজোড়ায় সযত্নে বাঁধি ফিতে।"[১৫]

খ. "আমাদের দিন বদলায় নাকো মিতে!
হাঁ-করা জুতোটা অবাধ্য বড়ো, ভালো করে বাঁধো ফিতে।"[১৬]

গ. "আমাদের চলা এতেই কি শেষ হয়?
দাঁতালো পেরেক, তালি-খাওয়া জুতো অনেক কথাই কয়।"[১৭]

অভিজ্ঞতা যেকোন বিষয় পরিণত করে। বেকারত্ব কেন্দ্রিক কবিতাও তার ব্যতিক্রম হল না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বেকারত্ব বিষয়ে যে কবিতাগুলি লেখা হল তার আবেদন, প্রকাশ, সর্বোপরি ঝাঁঝ অনেক সূদরপ্রসারী। স্বাধীনতার পরের কবিরা অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক। তাঁরা নিজস্ব দর্শনের মধ্যে দিয়ে সমাজ তুলে এনেছেন। অন্যদিকে স্বাধীনতা পূর্বের কবিরা সমাজের মধ্যে থেকে নিজেকে দেখেছেন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য, স্বাধীনতা পূর্বের কবিতা রচনার সামাজিক প্রেক্ষাপট, মানুষের মননের গতিমুখ অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। কবিরা পরাধীনতার দেখে বড় হননি। তাঁদের সামনে ব্রিটিশ নামক কালাপাহাড় ছিল না। তাঁরা দেখেছেন ক্ষমতাবান মানুষ কীভাবে আত্মপ্রসারণ ঘটিয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 172 – 183
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রাজনৈতিক জোর যার মুলুক তার'। তাঁরা দেখেছেন অভাব সঙ্গী হলে কোনো মানুষই অন্য মানুষকে সাহায্য করছে না। চূড়ান্ত অবক্ষয়ী সমাজের সাক্ষী থাকলেন তাঁরা। ফলস্বরূপ তাঁদের কবিতায় আত্মদর্শনই বড় হয়ে উঠল। যে কোন সাহিত্যের এটাই বড় গুণ ও আবার দোষও। কবির ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগই স্বাধীনতা পরবর্তী বেকারত্বের কবিতায় সমাজের জলছাপ হয়ে ধরা দিয়েছে। ১৯৪৭-এর পর কৈশোর কাটানো কবিদের রচনার প্রতি মনোযোগ দিলে নজরে আসবে, কবিরা নির্দিষ্ট মানুষের ওপর ক্ষুব্ধ। তাঁরা আত্মপ্রতিষ্ঠা না পাওয়ার কারণ হিসাবে সমাজ ব্যবস্থার চূড়ান্ত অধপতনকেই দায়ী করলেন। তুষার রায় ও মণিভূষণ ভট্টাচার্য এই ধারারই অগ্রণী।

তুষার এবং মণিভূষণ দুইজনেই শৈশব কাটিয়েছেন পরাধীন ভারতে। কৈশোর অতিবাহিত করলেন স্বাধীন ভারতে। পূর্বেই বলা হয়েছে স্বাধীনতা আগে ও পরের বেকারত্বের কবিতায় আদল পুরোপুরি বদলে গেল। বিষ্ণু দে চারিত্রিক শক্তি ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য বলে আশা না হারিয়ে কণ্ঠ ছাড়তে বললেন। সমর সেন ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্মহীনের জীবনে আশার আলো দেখাতে পারলেন না; তাঁরা সমগ্র সমাজ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে এনে একাকী কাটাতে চাইলেন। কিন্তু সাতের দশকে এসে বাংলা কবিতায় বেকারত্ব প্রসঙ্গটা অস্তিবাদের উপর নির্ভর হয়ে গেল। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় অস্তিত্ববাদ ছিল না, এমন নয়; কিন্তু সেখানে উগ্রতা ছিল না। কাজ না পাওয়ার যন্ত্রণা ছিল সেখানে; কিন্তু কাজ না পাওয়ার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে অপরপক্ষকে আক্রমণের প্রসঙ্গ ছিল না। যেখানে একটি চাকরির জন্য নিজ আত্মার কাছে কাকুতি মিনতি ছিল না এমন নয়; কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার প্রচেষ্টাও ছিল না।

সাতের দশকের বেকারত্ব কেন্দ্রিক, তুষার রায়ের কবিতার শুরু থেকেই জোরালো কণ্ঠস্বরের দাবি শোনা যায়। একজন শিক্ষিত কর্মহীন যুবক কর্মখালি সন্ধান করবেন, সেটা স্বাভাবিক। বিষ্ণু দে'র 'বেকার বিহঙ্গে'র উল্লেখ আমরা করেছি। কিন্তু সেই কর্মখালির বিজ্ঞাপন তুষার রায়ের লেখায় উঠে এল –

"জিভ দিয়ে চেটে চুষে দেখে যায় কর্মখালি।"[১৮]

এটাকে কী বেশি বেশি বলা হয়েছে এমন বলা যায়! না যায় না। প্রতিটা কর্মহীন সংবাদপত্রে কর্মখালির বিজ্ঞাপন এইভাবেই দেখে। বৃহৎ জনসংখ্যার দেখে শূন্যপদের চেয়ে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেশি। স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়োজনের তুলনায় পদসংখ্যা কম। তাই প্রতিদিনের সংবাদপত্রে এমনভাবেই নজর রাখতে হয় যাতে কোন কর্মখালির সংবাদ বাদ না যায়। কর্মখালি বিজ্ঞাপন দেখার পর প্রাথমিক কর্তব্য হল সেখানে আবেদন করার। কিন্তু আবেদন করতে গেলে প্রয়োজন অর্থের। একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকের অর্থ আসবে কোথা থেকে। তুষার রায় লিখলেন –

"ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত বেঁচে আবেদনপত্রের আসল জোটায় মাশুল।"[১৯]

শিক্ষিত বেকারের মর্মস্পর্শী আত্মকথায় কবিতার শরীর ভাষা পেয়েছে। সচেতন-অচেতনের মেলবন্ধনে কবিতার তরণী বয়ে চলেছে। কখনও কল্পনা, আবার কখনও ঘোর বাস্তবের চিন্তা কর্মপ্রার্থীর মনে যে দোলচলতার সৃষ্টি করে তারই বর্হিগমন ঘটেছে তুষার রায়ের হাতে। কবি লিখেছেন –

"সারাদিন শঙ্কিত ভেবে - কে ডাকবে ইন্টারভ্যুতে
কি প্রশ্ন যোগ্যতাই বা কতোখানি চাই,
সাধারণ জ্ঞান? উপস্থিত বুদ্ধি, দৌড় ঝাপ? মশায়
এই ভাবতে মনে মনে তৎক্ষণাৎ দৌড় দ্যায় ম্যারাথন
ঝড়ের আঙুল নাচে টাইপ রাইটারে যেন উনি
হাজার লোকের মধ্যে মুহূর্তে বিজয়ী তারপর
উঁচু র‍্যাঙ্ক, ঝাঁ চকচকে অফিস আর্দালী, তুমি
সুখ বলতে ক-রকম টেরিলীন জানো তার স্যুটে
টসকাবে না ভাঁজ-স্টেনো তাকিয়ে থাকবে;"[২০]

এরপরেই চেতন জগতে আগমন। বুঝতে পারেন এত বড় পদে চাকরির ইচ্ছা প্রকাশ করা উচিত নয়। একজন বেকারের প্রত্যেকটা মূহুর্তের যন্ত্রণা অনুধাবন করিয়েছেন তুষার। চাকরি সবার প্রয়োজন। তার জন্য উদগ্র ইচ্ছা কতজনের থাকে!

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিতে ভর করে সমস্ত রকম প্রস্তুতি নেওয়ার পরেও যখন বেকার, সকার হয়ে উঠতে পারে না তখনই সে নিজের দিকের যে কোন রকমেই ছোট্ট সমস্যাকে বিচ্যুতি হিসাবে ধরে নেয়। কিন্তু সে এও জানে চাকরিটা না পেলে তার শোচনীয় পরিণতি হবে। কবি লেখেন –

> "না না, ও পোষ্ট না হলেও আর্দালী অন্তত/ অন্তত পক্ষে স্যার নুনভাতের সুযোগটুকু দিন/ না হলে সব সময় চিন চিন করছে ব্যথাভরা বুক/ খুক খুক করে উঠছে কাশি, না না স্যার যক্ষ্মা নয়/ ডিসকলি করবেন না।"[২১]

সুতরাং প্রয়োজন যেকোনো একটি চাকরি। চাকরির জন্যই একজন শিক্ষিত বেকার নিজের যাবতীয় স্বপ্নের বিসর্জন দিতে রাজি হয়ে যাই। তাইতো 'গ্রুপ ডি' পদে চাকরির জন্য আবেদন করে বসে শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে উঁচু ডিগ্রিধারী ব্যক্তিটিও। একথা অবশ্যই মান্য যে কোন কাজই ছোট বা বড় নয়। একজন সমাজ গড়ার কারিগরকে দিয়ে আপনি স্টেশন পরিষ্কার করাতেই পারেন, তাহলে সমাজ গড়তে কাকে ব্যবহার করবেন! এমনিতেই শিক্ষকতার পেশায় আসতে চাইলে একজন যুবক-যুবতীর বয়স অন্যদের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যায়। শিক্ষকতার সমগ্র যোগ্যতা অর্জন করার পর সে যখন বোঝে, তাকে স্কুল স্তরের যোগ্যতা দেখিয়েই চাকরি অর্জন করতে হচ্ছে; তখন পরবর্তী প্রজন্মকে উচ্চতর শিক্ষামুখী করতে পারবেন তো! যদি না পারেন সমাজ তৈরি করবে কারা? উচ্চশিক্ষিত যুবক বা যুবতী না হয় স্বপ্ন ছেড়ে কোন কিছু মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেই নিল। এ প্রসঙ্গে কবি লিখলেন –

> "বলুন স্যার কি করতে হবে
> আপোস করতে করতে পাপোশ হতেও পারি এখন
> এখন আমি পয়সা পেলে সব করতে পারি,"[২২]

যদিও এটা যে কতটা কষ্টের, যন্ত্রণার, লাঞ্ছনার তা বেকার ছাড়া অন্য মানুষের জানা সম্ভব নয়। আসলে সহানুভূতি জানানো যায়; কিন্তু সম-অনুভূতি বড়ই দুর্লভ বস্তু। এত কিছুর পরেও যখন চাকরি জোটে না, তখন করণীয় আর কিছু থাকে না! মৃত্যু অনিবার্য। আত্মহত্যা অপরাধ জেনেও সে পথেও পা বাড়াতে হয় কর্মহীনের। উপায়? শরীরে বিষ প্রয়োগ। প্রয়োজন অর্থের। সেটুকুও থাকে না পকেটে। প্রয়োজন অন্যের সাহায্যের। কবি তুষার কলমে বিষয়টা এমন দাঁড়াল –

> "... এখন
> 'চাকরি যদি নাও দ্যান স্যার চারটে টাকা অন্তত
> দিন, চিনচিনে এই বেঁচে থাকার যন্ত্রণাটা বলে
> ফলিডলের গুণপনা, দরখাস্তের মাশুল, তুমি
> চাকরি না হোক-চার বেহারার কাঁধে চেপে যাবে।"[২৩]

বেকারত্ব বিষয়ক মণিভূষণ ভট্টাচার্যের লেখা জনপ্রিয়তম কবিতা 'বেকারের চিঠি। বেকারত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ যুবকের আত্মকথা সম্বলিত দীর্ঘ কবিতা। গল্পের-নাটকীয় উপস্থাপনা রয়েছে কবিতায়। একটা চলন আছে। ঠোক্কর খাওয়া জীবনের পরিণতিতে সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাননি কবি। চেয়েছেন সমাজের পরিবর্তন। যার জন্য ভরসা রেখেছেন বিপ্লবের ওপর।

কবিতার শুরুতে কবি কিছুটা দুলকি চালে চলেছেন। হঠাৎ চমকে উঠতে হয় যখন কবি লেখেন ভোট আমাকে বয়কট করেনি আমি ভোট ছেড়েছি। গণতন্ত্রের প্রধান বিষয় ভোট। স্বাধীনতার পরের তিনটে দশকে সমগ্র দেশ, দেশের প্রায় প্রত্যেকটা সংস্থা হয় ভোট, না হয় ভোট মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। সব বিষয়ে রাজনীতি শেষ কথা হয়ে ওঠে। ভোট সর্বস্ব দেশে এক বেকারের কথা কবি শুরু করলেন ভোটের কথা বলে। কর্মহীন যুবকরূপী কবি 'গণতন্ত্রের উৎসব' ভোটে যোগ না দিয়ে ভোট বয়কট করলেন। মণিভূষণ লিখেছেন –

> "আমার বয়স যে বছর একুশ পূর্ণ হোলো-
> ভোট দিলাম।
> দ্বিতীয়বার যখন চটের পর্দা-ঢাকা খোপরিতে ঢুকে

প্রগতিশীল প্রতীক চিহ্নে ছাপ মারছি তখন আমি ছাব্বিশ।
ঊনত্রিশ বছর বয়সেও বিশ্বের নিঃস্বতম গণতন্ত্র রক্ষার জন্য
আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিলো।
কিন্তু এ বছর ভোটের দিন সারাদুপুর তক্তপোষে শুয়ে
বেড়ার ফোকর দিয়ে পতাকা-ওড়ানো রিকসার যাতায়াত দেখেছি
কিন্তু ভোট দিতে যাই নি।
না, আমি ভোট বয়কট করিনি-
ভোট আমাকে বয়কট করেছে।
কারণ আমার বয়স একত্রিশ
তিরিশের পর সরকারি চাকরি পাওয়া যায় না।
যে সরকার আমাকে চাকরি দেবে না-
সেই সরকার গঠনের জন্য
গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর-
এরকম আশা করা যায় না।”[২৪]

প্রাথমিক ঝোঁকে মনে হতে পারে, সরকারের কাজ শুধুমাত্র চাকরি দেওয়া নাকি! কিন্তু মনে রাখতে হবে কর্মহীনহীন যুবকের কথা আমরা শুনছি। বেকারত্বের যন্ত্রণাদগ্ধ অভিমানী এক যুবক নিজেকে সংসদীয় গণতন্ত্র অর্থাৎ গোটা সিস্টেম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছে। প্রশ্ন করা যেতে পারে কেন এমন হল? স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ঘটা করে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হয়েছে। সংসদীয় বিশেষত ভারতীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পৃথিবী শ্রেষ্ঠ। এহেন প্রচারে বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরেও তার প্রতি অনাস্থা। ঘোর অন্যায়! মণিভূষণ কৈশোর অতিবাহিত করেছেন স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে। স্বাধীনতা আনয়নের কান্ডারীদের সম্মান প্রাপ্তির বছর সেগুলো। স্বাভাবিকভাবেই, কবির স্বাধীনতা নিয়ে অত্যাধিক পরিমাণে আবেগী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হলেন না। পেটে খাবারের অভাব থাকলে মার্কস-লেলিন, কৃষ্ণ-আল্লা, যিশু-বুদ্ধ প্রত্যেকে ‘ঝলসানো রুটি’ হয়ে চোখে ধরা দেয়। মণিভূষণও ব্যতিক্রম নয়। আবারও প্রশ্ন মণিভূষণই কেন? স্বাধীনতার পর তো বাংলা সাহিত্যে অনেক কবি এসেছেন। অনেক মানুষের প্রত্যেক বিষয়ে প্রতিক্রিয়া যেমন এক নয়, তেমনি সাহিত্যিকদের সেরকম। স্বাধীনতা পর বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান কবি বলে পরিচিত কবিবৃন্দ কী স্বাধীনতা নিয়ে প্রচন্ড ভাবিত ছিলেন? নাকি স্বাধীনতার বিষয়টা তাঁরা কাব্য রচনায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। যারা স্বাধীনতাকে কবিতায় স্থান দিলেন তারাও সুফলের চেয়ে কুফলকেই দেখাতে থাকলেন। স্বাধীনতার সপক্ষে কলম তোলা কবির সংখ্যা বেশি নয়। ১৯৫০-এর পরের কবিরা সচেতনে কাব্যজগতে স্বাধীনতাকে স্থান না দিলেও পরোক্ষ প্রভাব সাহিত্যে থাকবেই। স্বীকার্য এও যে, অভাব এবং অভাবকে খুব কাছ থেকে দেখা কবি-সাহিত্যিকরা স্বাধীনতা ও পরবর্তীতে দেশেরচালিকা শক্তিকে সুনজরে দেখেননি। মণিভূষণ তাদেরই একজন। আলোচ্য কবিতার পরবর্তী অংশে কবি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিরোধিতার কারণ তুলে ধরেছেন। এবং শেষে বিপ্লবের প্রতি ভরসা রাখলেন।

‘বেকারের চিঠি’ কবিতার মূল থিম একসুতোয় বাঁধা থাকলেও পাঁচটি সূক্ষ্ম আলাদা ভাগ করেছেন কবি। সচেতন পাঠক মাত্রই তা খেয়াল করবেন। প্রথমভাগে রেখেছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বর্জন, দ্বিতীয়ভাগে বর্জনের কারণ, তৃতীয়ে রয়েছে জীবনের কঠিন পরিণতি, চতুর্থ বেকারের স্বীকারোক্তি, পঞ্চম প্রতিবাদী মুখ। সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে ১৯৫১ সালে নতুন করে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়। সংরক্ষণ/ কোটা পদ্ধতি জাত-পাতের ওপর নির্ভরশীল, তা বুঝতে সমাজবিজ্ঞানী হওয়া দরকার নেই। অনেকে বলেবেন, সংরক্ষণ জরুরি। প্রাচীনকালে উচ্চবর্গের পক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী আধুনিক ভারতে নিম্নবর্গের মাত্র ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। দেশের পরিস্থিতিতে সংরক্ষণ পদ্ধতির বিলুপ্তির সময় এখনও আসেনি বলেই মত তাত্ত্বিকদের। আমরাও সেই মতই পোষণ করি। পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের কোন যুবক বা যুবতী

সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে সরকারি চাকরি গ্রহণ করেতেই পারেন। সমাজে চাকরি একটা আর্থিক স্বাবলম্বনের উপায়। সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক উন্নতি পরেও যুবক/যুবতীর পরবর্তী প্রজন্ম শুধুমাত্র পদবি নিম্নবর্গ চিহ্নিত হওয়ার দরুন দ্বিতীয়বার সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করেন। হয়তো কিছু মানুষ বলবেন উচ্চবর্গের মানুষেরা যুগের পর যুগ সুবিধা ভোগ করেছেন, এখন আমাদের পালা। তাদের উদ্দেশ্যে বলা, ভুলকে ভুল প্রমাণ করতে আরও ভুল, এটা কেমন যুক্তি।

মণিভূষণ সংরক্ষণের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলেননি কবিতা জুড়ে। তিনি শুধুমাত্র সংরক্ষণের গেরোয় আটকে যাওয়া বয়সের কথা বলেছেন। একই সঙ্গে দুর্নীতি মাধ্যমে সার্টিফিকেট জাল করে বয়স কমানোর পদ্ধতির কথাও বলেছেন। ন্যায়নীতি বর্জিত দেশে প্রত্যেক মানুষই বিবেকবর্জিত হবে, তা নাও হতে পারে। কবি তারই চিত্র তুলে ধরলেন–

> "বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য বয়স পাঁচ বছর শিথিলযোগ্য,
> কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বিশেষ কারণ
> বিশেষভাবেই অনুপস্থিত।
> অগত্যা সরকারি চাকরি পাবার একটাই উপায় আছে
> সার্টিফিকেট জাল করে বয়স কমিয়ে ফেলা।
> কিন্তু হে নন্দিত নেতৃবৃন্দ, যদিও আমার চোখের উপর
> আপনাদের অনির্বচনীয় লীলাময় জীবন খোলা আছে
> তবু জালিয়াৎ হতে পারবো না –
> আমার বাবা সৎ ছিলেন।"[২৫]

যে যুবকের আত্মকথা কবিতায় রয়েছে, তার বাবা একজন টাইপ রাইটার। দিনমজুর ব্যক্তি উত্তরাধিকারের জন্য রেখে গেছেন,

> "গর্তে-ঢুকে যাওয়া ফ্যাকাশে হলুদ রঙের দুটো চোখের/ শূন্য দৃষ্টি এবং অকেজো টাইপ মেশিন।"[২৬]

নিজের শরীরে সর্বস্ব উজার করে দিনমজুর পিতা সন্তানটিকে 'লায়েক' করে তুলতে চান। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আর্থিক এবং সামাজিক দুটোরই প্রাপ্তি ঘটে সরকারি চাকরিতে। সেকারণেই পৈতৃক সম্পত্তি বর্জিত যুবক/ যুবতী প্রধান অবলম্বন চাকরি। যখন সেটি না ঘটে দিশেহারা হয়ে পড়ে কর্মহীনটি। কবিতায় দেখা যায় কখনও কলা, কখনও ডাব, চিরুনী, ব্লাউজ, ধূপকাঠি, তরমুজ, চাল, হোসিয়ারী মাল, বিক্রি বা ব্যবসার চেষ্টা করে যুবকটি। কিছুতেই পসার জমে না। ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি না থাকায় এর কারণ। অভাবে বিনা চিকিৎসায় মায়ের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু দিয়ে অন্য দুর্নীতির উপস্থাপন করেছেন কবি। যা তৎকালীন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির একটি —

> "আমাদের এখানে গত কুড়ি বছরে আধখানা হাসপাতাল
> হয়েছে, বাকি আধখানা আর হবে না, কারণ প্রধান রাজনৈতিক
> দলের নেতারা অধিকাংশই ডাক্তার এবং তাদের
> নার্সিং হোম আছে।"[২৭]

ছোট্ট কয়েকটি কথা, কতবড় বার্তা দিয়ে যেতে তার নমুনা এটি। আরও বেশ কয়েকটি দুর্নীতির কথা উঠে আসে কবিতায়। সেখানে নারী পাচার থেকে, পূর্ত মন্ত্রী হয়ে কালোবাজারি করার ইচ্ছা সবই রয়েছে। একই সাথে উল্লেখ হতে দেখি আজকের দিনে প্রায় মিথে পরিণত হয়ে যাওয়া কয়েকটি পঙক্তি —

> "চাকরি আমার হতো।
> ... আমার বন্ধুরা
> যারা ঠিক ঠিক জায়গায় তেল সরবরাহে
> আরব রাষ্ট্রগুলিকেও হার মানিয়েছে
> আমি যদি তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

নামতে পারতাম তাহলে আমার গলায়
বাদামের ঝুড়ির বদলে নেকটাই ঝুলতো।"[২৮]

এরপরের কবি রেখেছেন স্বীকারোক্তি মূলক কয়েকটি কথা। একে স্বীকারোক্তি না বলে 'লোকে কী বলবে' তাই নিয়ে চিন্তা বলা যায়। দুঃখ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বেকার যুবক কোন সিদ্ধান্ত নিলে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কথা বলবে। যেমন- সন্ন্যাস হলে বলবে 'পালিয়ে গেল'; বিদেশি টাকায় পুষ্ট জনসেবা প্রতিষ্ঠানে ঢুকলে লোকে বলবে 'গুপ্তচর'; আবার নিজের সঙ্গে ঘটা অন্যায়ের সরাসরি প্রতিবাদ করলে রাজনীতির লোকেরা বলবে 'নকশাল'। প্রতিবাদের মাত্রা বাড়লে বিদেশি মদতপুষ্ট বলে দেগে দেওয়া হবে। সরাসরি প্রতিবাদের বদলে প্রতিরোধ গড়ে উঠবে ঘুর পথে। এ প্রতিরোধ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের নয়। সমাজ ব্যবস্থা বদলের বিপ্লব। কবির ভাষায় —

"কশাইয়ের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের মতো জীবন আমাদের-
যে-কোনো মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারি–আবার
এই আঙুলের কেন্দ্রীভূত চাপে খোলা ফাটিয়ে বের করে আনা যায়
রাজনৈতিক ক্ষমতার পুষ্টিকর তৈলবীজ, আর সমস্ত শুকনো খোসা
বাতাসে উড়ে যায়, বাতাসের সঙ্গে আকাশ স্পর্শ করে
মানুষের অনন্ত ঘৃণার আগুন–
সেই আগুনের পাশে বসে আছেন আমার মা,
আমার দেশজননী।"[২৯]

বেকারত্বের যন্ত্রণা গত একশ বছরের সমাজে নতুন কিছু নয়। প্রতিদিনই কোন কর্মহীন মানুষ সাহিত্যে যন্ত্রণার খোদাই করছেন। তারই হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতার উপস্থাপন করা হয়েছে প্রবন্ধে। বাঙালি চরিত্রের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বেকারত্বের কবিতায় প্রতিরোধের পরিবর্তে যন্ত্রণার কথায় বেশি ফুটে উঠেছে। বাংলা বেকারত্বের কবিতায় নিজস্বতা বলতে বলা যায় কর্মহীনের যন্ত্রণার উল্লেখ।

Reference:

১. সেন, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ও দাস শ্রীশিশিরকুমার, অর্থশাস্ত্র পরিচয়, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ নভেম্বর, ১৯৫৯, পৃ. ৪১৮
২. https://www.nextias.com/blog/unemployment/#Causes_of_Unemployment_in_India শেষ দেখা ১৪.৯.২০২৪
৩. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪২০, পৃ. ১৬৬
৪. তদেব, পৃ. ১৬৬
৫. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা,পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৯৯
৬. বিশী, প্রমথনাথ, রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, পৃ. ৯৪
৭. দে, বিষ্ণু, কবিতা সমগ্র, জিষ্ণু দে (সম্পাদিত), সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬২
৮. তদেব, পৃ. ৬২
৯. তদেব, পৃ. ৬২
১০. দেব, সব্যসাচী (সম্পাদনা), সমর সেন, কয়েকটি কবিতা, অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৫৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 172 – 183
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১১. তদেব, পৃ. ৫৬
১২. দেব, সব্যসাচী (সম্পাদনা), বীরেন্দ্র সমগ্র প্রথম খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ১০৮
১৩. তদেব, পৃ. ১০৯
১৪. তদেব, পৃ. ১০৯
১৮. তদেব, পৃ. ১০৮
১৭. তদেব, পৃ. ১০৯
১৮. নাগ, অজয় (সম্পাদিত), তুষার রায়ের কাব্যসংগ্রহ, ভারবি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০১৬, পৃ. ৭১
১৯. তদেব, পৃ. ৭১
২০. তদেব, পৃ. ৭১
২১. তদেব, পৃ. ৭১
২২. তদেব, পৃ. ৭২
২৩. তদেব, পৃ. ৭২
২৪. ভট্টাচার্য, মণিভূষণ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১১৭-১১৮
২৫. তদেব, পৃ. ১১৮
২৬. তদেব, পৃ. ১২০
২৭. তদেব, পৃ. ১১৯
২৮. তদেব, পৃ. ১২০
২৯. তদেব, পৃ. ১২২